মুক্তিযুদ্ধে ব্যাক্তি বিশেষের অবদান এবং মূল্যায়ন (শেষ পর্ব)

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হটাত করে শুরু হয় নাই। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্ব ছিল এই মুক্তিযুদ্ধ। যার বীজ বোপিত হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে। এর পর ষাটের দশকে ছয় দফা অন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। ৬৯ এর গনভ্যুথ্যানের বিজয় ছিল এর পরর্বতী ধাপ। ১৯৭০ নিব্বাচনে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে একক বিজয় এই স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন'কে সাংবিধানিক বৈধতা দেয় এবং বাঙ্গালীর ইতিহাসে এই প্রথম সবাই'কে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগঠিত করে; এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি ক্ষেত্র (Launching Pad) তৈরী করে।

এই সুর্দীঘ সময় ধরে প্রতিটি আন্দোলন, ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির মুক্তির জন্য অবদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ঠিক পরেই যার অবস্থান, তিনি হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ। তার পর পরই অবস্থান অন্য তিন জাতীয় নেতার।

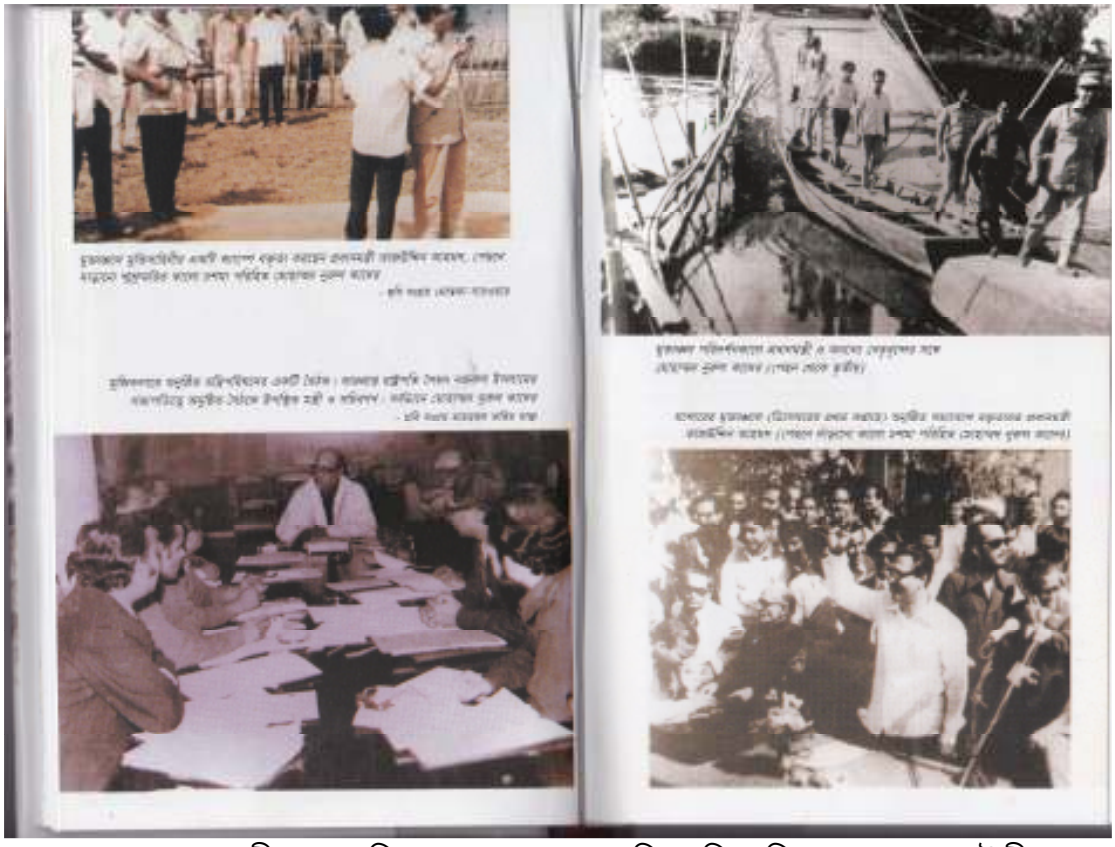

১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রানলয়ের দ্বায়িত্বে নিয়োজিত জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ।

ষাটের দশকে আওয়ামী লিগের পাশাপাশি সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এবং শেখ মনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগও অত্যন্ত গুরুত্বর্পূন এবং গঠনমূলক ভূমিকা রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুজিব বাহিনী গঠনের কারনে এই চার যুবনেতা বিতর্কিত হলেও, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী'র (অবঃ) অবস্থান ছিল তারও পরে কারন কর্নেল ওসমানী (অবঃ) ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লিগের মাধ্যমে রাজনীতি'তে যোগদান করেন এবং আওয়ামী লিগের টিকেটেই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লিগে যোগদানের আগে কর্নেল ওসমানী (অবঃ) বরাবরই রাজনীতি থেকে দুরে ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্নেল ওসমানী (অবঃ) শুধুমাত্র আওয়ামী লিগ দলীয় সংসদ সদস্য বিধায়ই মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই নিয়োগের মধ্য দিয়েই 'অসাধারন দুরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ' মুক্তিবাহিনীর সামরিক নেতৃত্ব'কে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসেন! মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রানলয়ের দ্বায়িত্বে ছিলেন, এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী তার অধীনে ছিলেন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী (অবঃ)। বলাই বাহুল্য, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সংসদ সদস্য কর্নেল ওসমানী (অবঃ) এর অধীনে ছিলেন সব সেক্টর কমান্ডাররা।

সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে খালেদ মোশাররফ, তাহের সরাসরি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এবং শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ৮ বেঙ্গল ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় এবং শফিউল্লাহ ও মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে ২ বেঙ্গল জয়দেবপুরে, জিয়াউর রহমানের আগেই বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। দূর্ভাগ্যবশত, ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় এবং জয়দেবপুরে রেডিও ষ্টেশন না থাকায় এই খবর অন্য স্থানের জনগনের কাছে পৌছায় নাই।

মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবস্থান/অবদান ছিল অনান্য সেক্টর কমান্ডারদের সাথে, আরও পরে। সঙ্গত কারনেই আমরা দেখতে পাই যে, সবাই জানে ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে প্রবাসী সরকার, এবং ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরেছিলেন। কিন্তু কেউ জানে না বা জিজ্ঞেস'ও করলো না, জিয়াউর রহমান কবে ঢাকায় ফিরেছিলেন, কারন জিয়াউর রহমান তখন গুরুত্বর্পূন কেউ ছিলেন না এটা সর্বজনবিদিত!

তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বিতর্কিত বক্তব্যঃ

১। বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান! ১৯৭১ সালের ২৬-২৭ মার্চে চট্টগ্রাম রেডিও ষ্টেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনার এক পর্যায়ে 'চট্টগ্রামে অবস্থিত জীবিত বাংগালী অফিসারদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান' চট্টগ্রাম রেডিও ষ্টেশনে এসে প্রথমে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষনা দেন।

আসাধরন ইন্টুইসন, দ্রুত পরিস্থিতি অনুধাবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকারী ও স্মার্ট মেজর জিয়াউর রহমান এর পর পরই আবস্থা বেগতিক দেখে, তিনি ‘বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর’ পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন।

সুযোগ সন্ধানী মেজর জিয়াউর রহমান’এর নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষনা করার কোন রকম সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, নৈতিক বৈধ্যতা তো ছিলই না আর তাই আমরা দেখতে পাই, সঙ্গত কারনেই পরর্বতীতে তার শপথ গ্রহন করার বা পদত্যাগ করারও কোন প্রয়োজন হয় নাই। বরং ১৭ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে মুজিব নগর সরকার গঠনের পর নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষনা করার সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে দাড়িয়েছিল মেজর জিয়ার জন্য এক মস্ত বড় এক কৌশলগত ভূল পদক্ষেপ।

সেই ঘোষনার মধ্য দিয়েই আমরা জিয়াউর রহমান’এর উচ্চাভিলাসের প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। একই সঙ্গে ৭১ এর মার্চের আরো কিছু বিতর্কিত এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য মুক্তিবাহিনীর সব্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী (অবঃ) সহ অনেকেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। লক্ষ প্রানের বিনিময়ে এবং বিশেষত ‘অর্ন্তঘাত ১৯৭১’ সহ অনেক বইয়ে আমরা তার বিশদ র্বননা পাই।

অবস্থা বেগতিক দেখে ততকালীন মেজর জিয়াউর রহমান’ও ব্যাপারটা সর্ম্পূন চেপে যান ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত, যেন সর্ম্পূন ব্যাপারটাই ছিল ‘স্লিপ অফ টাং’!! এই সব সন্দেহের কারনেই স্বাধীনতার পর সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও জিয়াকে সুপারসিড করে সফিউল্লাহ’কে সেনা প্রধান করেন জেনারেল ওসমানী।

তাই তো ৭ নভেম্বর ৭৫ পরর্বতী সময়ে অগনতান্ত্রিক ভাবে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হলেও জিয়াউর রহমান’ বা তার সাংগোপাংগোরা আর কখোনোই সেই প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ঘোষনার ব্যাপারটা মুখেও আনেন নাই। কারন তারা জানতেন, এই নিয়ে কথা বলতে গেলে কেচো খুড়তে সাপ বের হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, নৈতিক বৈধ্যতা ছাড়া রেডিও টি ভি’তে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষনা করলেই কেউ প্রেসিডেন্ট হয় না, বরং পরর্বতীতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন হয়েছিল বিমান সেনা আজফার’কে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, “১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রাত দুটার পর থেকেই শুরু হয় ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় ‘সিপাহী বিপ্লব’! বিপ্লবী সৈনিকরা, যার বেশীর ভাগই ছিল বিমানবাহিনী্র সদস্য তারা বিমান বন্দরে হামলা করে ১১ জন বিমান বাহিনীর অফিসারকে হত্যা করে। বিপ্লবী সৈনিকরা রেডিও ষ্টেশন দখল করে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষনের ঘোষনাও দেয়। সেদিন এ ঘোষনায় জনৈক আফজারকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষনা করা হয়েছিল”! (৪, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬)।

১৯৭১ সালে সেক্টর কমান্ডার’দের সম্মেলনে সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। এই ছবিতে জিয়াউর রহমাদের অবস্থানই বলে দেয় মুক্তিবাহিনীতে তার অবস্থান এবং গুরুত্বের কথা।

২। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী পাসর্পোট নিয়ে বাংলাদেশে আসেন! তারেক রহমান প্রশ্ন করেছিলেন যে, (বঙ্গবন্ধু) “শেখ মুজিব কিভাবে প্রথম প্রেসিডেন্ট হন, কারন তিনি তো পাকিস্তানী পাসর্পোট নিয়ে ১০ জানুয়ারী বাংলাদেশে আগমন করেন?” আসলে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এই ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার বেশ কয়েক মাস পর প্রথম বাংলাদেশের পাসর্পোট বই প্রদান শুরু হয়। তাই সেই সময়ে সরকারী র্কমর্কতা বা বেসরকারী ব্যাক্তির্বগ সবাই পুরাতন পাকিস্তানী পাসপোর্টের নিয়েই বিদেশে যাতায়ত করতেন। ১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে সেনা উপপ্রধান জিয়াউর রহমান তার স্ত্রী খালেদা জিয়া’কে নিয়ে পাকিস্তানী পাসপোর্টেই কানাডা যান। স্বাধীনতার পর অনেক বছর স্বাধীন বাংলাদেশে’ পাকিস্তানী মুদ্রা চালু ছিল। তাই তারেক রহমানের প্রশ্নের কোনরকম ভিত্তিই নেই।

নিরপেক্ষ বিচারে ১৯৭১ এর ২৭মার্চ নয়, ১৯৭৫ সালের ৭'ই নভেম্বর হচ্ছে জেনারেল জিয়াউর রহমান'এর জীবনে'র চরম ও উজ্জলতম ক্ষন। ১৯৭১ সালে 'সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায়' থাকার কারনে প্রথম সামরিক অফিসার হিসাবে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন, যা মানুষকে সাহস জোগায়। সেখানে মেজর রফিক বা মেজর সফিউল্লাহ ঘোষনা পাঠ করলেও, ফলাফল একি হতো, দেশ একই দিনে, ১৬ ডিসেম্বর'ই স্বাধীন হতো, কোন হেরফের হতো না।

অন্যদিকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন সেনাপ্রধান। একদিকে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা নিহত। অন্যদিকে জেনারেল সফিউল্লাহ অপসারিত, সি জি এস খালেদ মোশাররফ ও কে এন হুদা নিহত। একদিকে নেতৃত্বে চরম শূন্যতা এবং অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহ র্কনেল তাহেরের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গ্যাছে, যে কোন সময় অনান্য ক্যান্টনমেন্ট গুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঠিক সেই সময় জেনারেল জিয়াউর রহমান'এর সঠিক নেতৃত্ব দেশকে অনেক প্রানহানি ও চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচায়।

৭ নভেম্বর, জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহসের সাথে সেনা অফিসারদের নেতৃত্ব না দিলে, দেশের নেতৃত্ব, প্রথমে (লাইবেরিয়া'র মত) অশিক্ষিত ও উশৃংখল সৈনিক'দের হাতে চলে যাওয়ার এবং পরে গৃহযূদ্ধ শুরু হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এই রকম এক চরম ঘোলাটে অবস্থায়, সেনা অফিসারদের এক সমাবেশে জেনারেল জিয়াউর রহমান সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে পরিস্থিতি' সামাল দেন এবং সেনবাহিনী'কে (এবং দেশ'কে) চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।

রেডিও তে নাম প্রচারের সুফল যে কতটা ফলপ্রসূ, তা ৭১ সালে'ই জিয়াউর রহমান বুঝেছিলেন। জিয়াউর রহমান তার ভাষন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করেন এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' দিয়ে শেষ করেন, এবং একই সাথে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দেন।

পরর্বতী দিনগুলিতে র্কমকান্ডের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক অবস্থান আরো পরিস্কার হয়ে উঠতে থাকে। জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করলেও, বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমেদ সহ জাতীয় চার নেতার র্নিমম হত্যাকান্ডের বিচার করা তো দূরে থাক, হত্যাকারীদের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদের লোভনীয় পদে নিয়োগ দেন। দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত কূখ্যাত শাহ আজিজ'কে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন। জিয়াউর রহমান আমৃত্যু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব দেন এবং ফলশ্রুতিতে মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার'দের হাতেই তিনি নিহত হন!

আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একটি জাতি, তাই আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে ক্রান্তিলগ্নে আমরা একসাথে পেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমেদ'এর মত নেতাদের । যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পেয়েছিল লেনিন এবং ট্রটস্কি, ভিয়েতনাম পেয়েছিল হো চি মিন এবং জেনারেল গিয়াপ, কিউবার বিপ্লবীরা পেয়েছিল ক্যাস্ট্রো এবং চে।

আবার একই সাথে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ সহ জাতীয় চার নেতার যথাযথ মূল্যায়ন'তো দুরের কথা, তাদের নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারও এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই! শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমেদ সহ জাতীয় চার নেতার অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন' করা হলে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমান'এর অবস্থান বা অবদান'কে কখনোই বঙ্গবন্ধুর সমান্তরাল করার ধৃষ্টতা কারো হতো না!

মেধা, সততা, দেশপ্রেম এবং ত্যাগ'এ তাজউদ্দীন আহমেদ ছিলেন অতুলনীয় ,তাই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবনগর সরকারের প্রথম নিয়োজিত সচিব জনাব মোহম্মদ নুরুল কাদের তার 'একাত্তর আমার' গ্রন্থে বলেছেন "তাজউদ্দীন আহমেদ এর তুলনা শুধু তাজউদ্দীন আহমেদ'এর সাথেই হতে পারে"। তাই তো সরদার ফজলুল করিম স্যার ও ইংরেজিতে বলেন, 'তাজউদ্দীন কেম বিফোর হিজ টাইম অ্যান্ড হি ইজ ইয়েট টু বি আন্ডারস্টুড।' নিজেই বাংলা করলেন, 'তাজউদ্দীন সময়ের অনেক আগে আর্বিভূত হয়েছেন, তাই তাঁকে বুঝতে আমাদের এখনো অনেক বাকি।'

নাজমুল আহসান শেখ, ২৩ জুলাই সিডনী, victory1971@gmail.com

তথ্য সূত্রঃ

১। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী
২। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৩। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৪। তিনটি সেনা অভ্যূথান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল এম. এ হামিদ
৫। একাত্তর আমার; মোহম্মদ নুরুল কাদের
৬। অর্ন্তঘাত ১৯৭১; মানিক চৌধুরী
৭। তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা; শারমিন আহমেদ

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর

কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ/বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর

তাজউদ্দীন আহমদের আলোকভাবনা

সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ

সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদিত), তাজউদ্দিন আহমদ/ইতিহাসের পাতা থেকে

সিরাজউদ্দীন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ: দলিলপত্র, ২-৬ খণ্ড